স্বপ্নেভরা কিশোরবেলা

রফিকুর রশীদ

সম্প্রীতি প্রকাশ

উ | ৎ | স | র্গ

প্রীতিভাজনেষু লেখক

স. ম. শামসুল আলম

এবং তাঁর স্বপ্নের সংগঠন

আনন ফাউন্ডেশনের উদ্দেশে

সূচি

বহমান ৯
শান্তামণির আঁকাআঁকি ১৭
মাতৃছায়া ২৭
স্বাধীনতা ৩২
স্বপ্ন বৃত্তান্ত ৩৭
এক বালকের প্রতিবাদ ৪২
খুশি দিবস ৫০
নীপার বাঁশি ৫৬
দাদির রেডিও ৬০
বাবার কাছে যাওয়া ৭০
শাজাহানের স্কুলে যাওয়া ৭৭
সাতই মার্চের ছবি ৮৫
বিজয় দিবসের গল্প ৯২

বহমান

'বাবা! ওই যে বঙ্গবন্ধু! ওই দ্যাখো।'

কণ্ঠ শুনে বুঝা যায় শামীম খুবই উত্তেজিত। বাম দিকের জানালার ফাঁক গলিয়ে আঙ্গুল তুলে সে দেখায়, চোখেমুখে তার বিস্ময়—'কী বিরাট ছবি দেখেছ!'

ঢাকাগামী শ্যামলী পরিবহনের কোচ বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে। বাইরে শেষ-মার্চের ঝকঝকে রোদ। চোখে এসে ঝাপটা লাগে। শামীমের বাবা ঢাকা-যাত্রার দুদিন আগেই রোদচশমা কিনে দিয়েছেন পুত্রের জন্যে। সেই চশমা পেয়ে কী যে আনন্দ তার, চোখ থেকে সেটা নামাতেই চায় না। এই কোচের ভেতরেও সে রোদচশমা পরেই বাবার পাশের সিটে বসেছে। কখন যে চোখ থেকে চশমা নামিয়ে দুপারের যমুনা নদীর সৌন্দর্য দেখতে শুরু করেছে কে জানে সেই কথা! শামীমের বাবা জানালার দিকে তাকাতেই এক ঝাঁক বকের সারি দেখতে পান, নদীর পানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। সেদিকে দৃষ্টি নেই শামীমের। তার চোখ পড়েছে বঙ্গবন্ধুর উপরে।

যমুনা পেরিয়ে ঢাকা যেতে হলে বঙ্গবন্ধুর উপরে যে-কারো দৃষ্টি পড়বেই! বঙ্গবন্ধু সেতুর দুপারে বঙ্গবন্ধুর নামে দুটি রেল স্টেশন। তারপরও আছে এই বিশাল আকৃতির ছবি। ছবি তো নয়, এর নাম মুর‍্যাল। সেতুর উপরে উঠলে বাসযাত্রী অথবা ট্রেনযাত্রী এদিকে না

তাকিয়ে পারবে না। এই পথের মজাই আলাদা। ভেড়ামারা পার হবার পর পদ্মা নদীর বুকের উপরে হার্ডিঞ্জ সেতুর পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে লালন শাহ সেতু। সেই সেতুতে উঠবার আগেই নজরে পড়ে মরমী সাধক লালন শাহ্ র বিশাল প্রতিকৃতি। সেটাও দেখেছে শামীম। লালনকে নিয়েও তার কৌতূহল কম নয়। এর আগে একদিন কুষ্টিয়ার পাশে ছেঁউড়িয়ায় গিয়ে লালন—সমাধিও দেখে এসেছে। তবু বাসে যেতে যেতে কথায় কথায় বাবার কাছ থেকে আরো অনেক কথা জেনে নিয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে তার আবেগের জায়গাটা একেবারে অন্যরকম। ওইটুকু ছেলে এমন সীমাহীন আবেগ যে কোথায় পেয়েছে সে কথা কেউ জানে না। তাদের পরিবারে সক্রিয় রাজনীতির বিশেষ একটা চল নেই বললেই চলে। মিছিল মিটিং স্লোগানের মধ্যে কেউ নেই। এ সব নিয়ে এক সময় সক্রিয় ছিলেন শামীমের দাদু। দাদির মুখে অনেক গল্প শুনেছে। রাজনীতির পোকা ছিল তাঁর মাথায়। রাজনীতি করার সুবাদে জেল খেটেছেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতার পর কী এক অদৃশ্য কারণে তাঁর হইচই থেমে যায়, একেবারে চুপচাপ হয়ে যান। দাদুকে তো দেখেনি শামীম, দাদির মুখে গল্প শুনেছে। দাদুর গল্প করতে করতে দাদি কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন, কখনো গর্ব করে শেখ মুজিবের ছবির কথা বলেন। পোস্টারে ছাপা সেই ছবি।

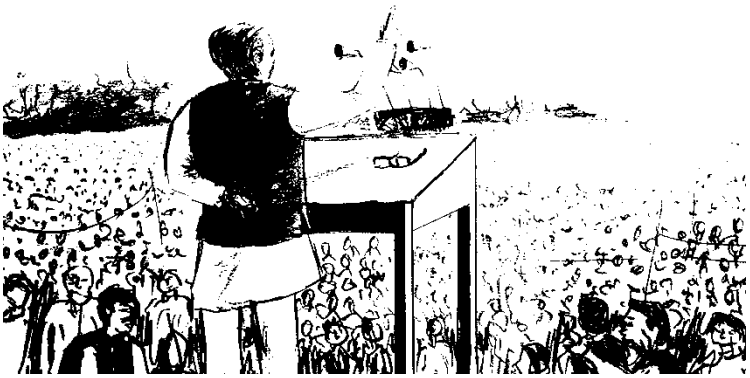

সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ছবি দিয়ে বানানো পোস্টার। রমনার রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আবেগময় কণ্ঠে

ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাঁর ডান হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুল আকাশের দিকে উঁচিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন—' এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' জন্মের পর থেকে পলিথিনে মুড়ানো এই পোস্টারটি দাদুর ঘরে টাঙানো দেখে আসছে শামীম। রাজনীতি না করলেও শামীমের বাবা একাত্তরের সাতই মার্চের এই বিখ্যাত ভাষণের প্রেক্ষাপট অনেকবার বুঝিয়ে বলেছেন। এ ভাষণ বহুবার মাইকে বাজতে শুনেছে শামীম, তবু বাবার মুখে সে-ভাষণের গল্প শুনে প্রবল আনন্দ পায়। একটুখানি বড় হবার পর শামীমকে দেখা গেছে দাদুর ঘরে সেই পোস্টারের তলে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর মতো আঙ্গুল উঁচিয়ে ভাষণ দেবার প্র্যাকটিস করছে—' আর যদি একটা গুলি চলে—' বাবার কাছে ধরাও পড়েছে দু একদিন, লজ্জা পেয়েছে খুব, বাবা তবু ঠাট্টা করেন—' গুলি যদি চলে, তাহলে কী হবে খোকা?'

দাদির দেখাদেখি বাবাও মাঝেমধ্যে শামীমকে খোকা বলে ডাকে, তাতে সে বিরক্ত হয়। ছেলেবেলায় বঙ্গবন্ধুরও যে এই নাম ছিল সেটা জানার পর গর্বে ভরে ওঠে তার বুক, তখন আবার খোকা ডাক শোনার জন্যে কান খাড়া করে থেকেছে। এভাবেই দিনে দিনে একটু একটু করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শামীমের নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং সে প্রবলভাবে বিশ্বাস করে—বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন, এই বাংলাদেশে আছেন। কারো কথা কিংবা কোনো যুক্তি সে শুনবে না।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে নেই—এ কথা কিছুতেই মানতে রাজি নয় শামীম। ভয়ানক একগুঁয়ে স্বভাব তার। এমনিতে বেশ ভালো ছেলে। ইশকুলের লেখাপড়ায় ভালো। খেলার মাঠে বন্ধুবৎসল। বাড়িতেও। রীতিমতো গুডবয়! তবু তার বাবার ধারণা— ছেলেটির মাথায় নির্ঘাৎ একটা বদরাগী পোকা আছে। সেই পোকা মাঝেমধ্যে তার মাথায় ঠোকর দেয়, তখন সে জেদী হয়ে ওঠে। কোনো কথা সহজে মানতে চায় না, গোঁ ধরে।

ইশকুলে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে রচনা প্রতিযোগিতায় সে জন্মতারিখটি ঠিকই লিখেছে, কিন্তু মৃত্যুতারিখ লিখতে গিয়ে বেঁকে বসে। কিছুতেই পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টের নির্মম সত্য সে মানবে না। মৃত্যুর কথা লিখবে না। রচনার শিরোনাম অমর বঙ্গবন্ধু। সে মৃত্যুহীন শেখ মুজিবের

শান্তামণির আঁকাআঁকি

আমাদের শান্তামণির অংকন প্রতিভা নিয়েও আমাকে কোনোদিন গল্প লিখতে হতে পারে, এ কথা আগে কখনো ভাবিনি। সম্প্রতি এক ছবি এঁকে সে আমাদের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সেই ছবি নিয়ে সারা বাড়িতে হইচই, তোলপাড়। এমন কি শান্তাদের স্কুলে পর্যন্ত এ নিয়ে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। ব্যাপারটা মোটেই হেলাফেলার নয়। শান্তা আমার ছোটবোন। তার আঁকা ছবি নিয়ে যখন এত কাণ্ড ঘটছে, তখন এই আঁকাআঁকির ঘটনা নিয়ে গল্প না লিখে আমি পারি!

এমনিতে আমাদের পরিবারে আঁকাজোকার বিশেষ একটা চল নেই। ছবি আঁকাকে ভালো কোনো কাজের মধ্যে গণ্য করা হয় বলেও মনে হয়নি কখনো। গত বছর স্বপন মামা আমাদের বাসায় বেড়াতে এলে তার লেখাপড়া নিয়ে যে-রকম ঠাট্টা তামাশা করা হয়, তাতে আমার ওই রকমই মনে হয়েছে। অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। বয়সে ঢের ছোট হলেও স্বপন মামার সঙ্গে আমাদের বাবার সম্পর্ক তো রসিকতারই, হয়তো অমন তামাশা করে বলতেই পারেন,

কী কলা বললে হে শালাবাবু, চারুকলা?

প্রশ্ন করেন, কিন্তু উত্তর না শুনে নিজেই আবার হা হা করে হাসেন। হাসির গতি কিছুটা কমলে বাবা আবারও যোগ করেন,

সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে শেষপর্যন্ত আর্ট কলেজে?

স্বপনমামা আপত্তি জানায়,

আর্ট কলেজ নয় দুলাভাই, চারুকলা ইন্সটিটিউশন। ওটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ফ্যাকাল্টি।

ওই হলো। তোমার কাঁধের ঝোলা দেখেই আমার বুঝা উচিত ছিল—হয় কবি নয় শিল্পী তোমার মাথায় ঢুকেছে।

বলতে বলতে বাবা বেশ বিষন্ন হয়ে যান। স্বপনমামার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উচ্চারণ করেন, তোমার কাছে আরেকটু বেশি কিছু আশা করেছিলাম হে! শুনেছি তুমি ভালো ছাত্র ছিলে!

স্বপনমামা চুপ করে থাকে।

বাবার সঙ্গে আর তর্কাতর্কি না করলেও পরে আমাদের দু'ভাইবোনকে এক সময় জানিয়েছে—চারুকলায় পড়াশোনা করাও খারাপ কিছু নয়। বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে পড়তে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই ইচ্ছে করেই চারুকলায় ভর্তি হয়েছে। আঁকাআঁকিটাই তার বেশি ভালো লাগে, সহজও লাগে।

শান্তা এবং আমি চমকে উঠি,

ছবি আঁকা সহজ?

স্বপন মামা একগাল হেসে এবং ঘাড় দুলিয়ে জানান, একদম সহজ।

আমাদের তো ঘোর কাটে না। অঙ্ক কষা বরং অনেক সহজ। বুদ্ধি খাটিয়ে বেশ করা যায়। কিন্তু ছবি আঁকাও সহজ? মাথা খারাপ! জ্যামিতির সামান্য কটা আঁক কষতে গিয়েই আমার হাতের সরলরেখা হয়ে যায় বক্ররেখা, আমি কেমন করে মামার কথা মানব! শান্তা খুবই ছোট মানুষ। তারও বুঝি মানতে কষ্ট হয়। সে বলেই ফেলে, তোমার কাছে না হয় সহজ, আমার কাছে তো নয়!

তোমার কাছেও সহজ হয়ে যাবে শান্তামণি, চেষ্টা করে দেখবে তো!

শান্তা নরম হয়ে আসে। স্বপনমামা ওর চুলের বেণী নাড়িয়ে বলে, যাও দেখি খাতা পেন্সিল নিয়ে এসো। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্যাপারটা কেমন সহজ!

মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকেছে। শুধু আঁকা নয়, সেই ছবি জমাও দিয়েছে স্কুলের ওই সংকলনে ছাপার জন্যে।

এ খবর শুনে আমাদের বাসার সবাই অবাক! শান্তা মুক্তিযুদ্ধের কী জানে যে তাই নিয়ে ছবি আঁকবে! আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলি, আঁকবে না বাবা, এঁকেটেকে ওদের স্কুলে সে ছবি জমা দেওয়া হয়ে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের ছবি?

বাবার যেন ঘোর কাটে না। আমাকে আবার জিগ্যেস করেন, তুই দেখেছিস সে ছবি?

না তো বাবা!

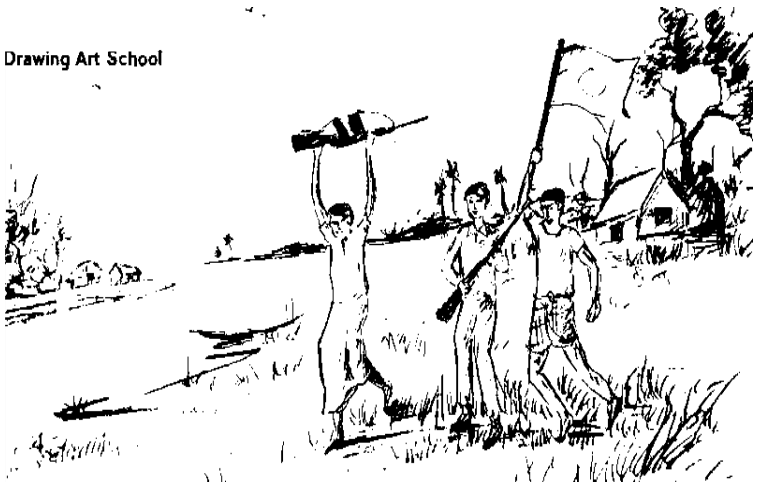

এরপর শান্তার ডাক পড়ে। শান্তশিষ্ট পুষি বেড়ালটির মতো নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়ায় বাবার কোল ঘেঁষে। বাবাও তাকে নিবিড় আদরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জানতে চান, কী ছবি এঁকেছিস মা?

মুক্তিযুদ্ধের ছবি।

আরেব্বাস! মুক্তিযুদ্ধের ছবি? কী রকম সেটা?

সে তো এখন বলা যাবে না বাবা! এই তো আর দুদিন পরে আমাদের ম্যাগাজিনটা বেরুলেই দেখতে পাবে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

মাতৃছায়া

বাঁশতলি প্রাইমারি স্কুলে আরো পাঁচজন সহকর্মীর মধ্যে থেকেও মণি আপা অতি সহজেই একা হয়ে যান, কীভাবে যেন আলাদা হয়ে যান। ক্লাসের ফাঁকে অন্যান্য টিচার যখন ব্যস্ত থাকেন ঘরকন্নার গল্প কিংবা কাজের বুয়ার স্বভাব চরিত্রের আলোচনায়, মণি আপা তখন বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকেন। কত তাদের অভিযোগ, অভিমান, কত যে নালিশ আর খুনসুটি! মণিআপা সব শোনেন মনোযোগ দিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীরাও হয়েছে তেমনি গা-লাগা। মনের ভেতরের সব কথা মণিআপাকে না বলে তাদের শান্তি নেই।

শুধু হই চই গল্পসল্প আর খেলাধূলা বলে তো কথা নয়, মণি আপা ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বাগানের কাজও করিয়ে নেন। এই বাঁশতলি প্রাইমারি স্কুলের সামনে এমন বাহারি ফুলের বাগান তো আগে ছিল না। হয়েছে মণি আপার উদ্যোগেই। এক বাগানের মধ্যেই আছে পাঁচ ক্লাসের ভাগ। এবারের শীতে অন্যান্য সারিতে বিশেষ একটা ফুলই ফোটেনি, কিন্তু ক্লাস ফাইভের সারিতে অসংখ্য ফুলের সমারহ ঠিকই চোখে পড়ে। রঙ বেরঙের ফুল ফুটিয়ে ওরা স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছে। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। সামনে আছে বৃত্তি পরীক্ষা। যে-কজনা বৃত্তি দেবে, তাদের ছুটি নেই; চলছে বিশেষ কোচিং ক্লাস। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। এত সিরিয়াস কোচিং ক্লাসের মধ্যেও মণি আপা একদিন বৃত্তি

স্বাধীনতা

আমাদের স্কুলের নতুন আপা ভারি মজার মানুষ। পড়ানোর বেলা ঠিকই পড়াবেন। মনে হবে যেন গল্প বলা শুরু হলো। এদিকে ওই গল্পে গল্পেই বইয়ের পড়া এগিয়ে যাবে। এক সময় আমরা টের পাব-আপা আমাদের ক্লাসের বই থেকেই গল্প কিংবা কবিতা পড়াচ্ছেন। গলার স্বর উঁচুনিচু করে যখন কবিতার লাইন মুখস্থ বলেন, তখন কি আর বুঝতে বাকি থাকে কারো? আমরা ঠিকই ধরে ফেলি। ফার্স্টবয় আকাশ ভয়ানক ঠোঁটকাটা স্বভাবের। সবার আগে সে-ই লাফিয়ে ওঠে— এটা তো কাজী নজরুলের কবিতা আপা, আমাদের বইয়েই আছে।

তাই নাকি! তোমাদের বইয়েই আছে বলছ!

নতুন আপার চোখেমুখেও অপার বিস্ময়, কবিতাটি যে আমাদের বইয়েরই কবিতা সে কথা যেন তিনি জানতেন না। আসলে অনেক পরে আমরা জেনেছি, সব কিছু জেনেশুনেও আমাদের সঙ্গে মজা করতে তিনি ভালোবাসেন। পড়া নিয়েও মজা করেন, পড়ার বাইরে অনেক কিছু নিয়েও মজা করেন। নতুন আপা কবে থেকে এই স্কুলে নতুন আপা হয়ে আছেন আমরা জানি না, আমাদের কাছে তিনি মজার আপা।

তা আমাদের এই মজার আপা সেদিন ক্লাসের পড়ার ফাঁকে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, স্বাধীনতা মানে কী জানো?

অফুরন্ত। আকাশ পাতাল, বনবনানী, সাগর-নদী, চাঁদ সূর্য—যেখানেই হাত দেবেন, সেখান থেকেই নিয়ে আসবেন স্বাধীনতার অজস্র উপমা।

আমাদের সাধারণ উত্তর আপার পছন্দ হবে কেন! তাঁর কাছে তো স্বাধীনতা মানে অনেক কিছু। আকাশজোড়া মুক্ত পাখির উপমা দিয়েও তাঁর মন ভরে না। তিনি বলেন, স্বাধীনতা মানে ভোরের সূর্যোদয়, রাতের আঁধার ছিঁড়ে আলোর উদ্ভাস। নদীর দিকে তাকিয়ে বলেন, স্বাধীনতা মানে সামনে এগিয়ে চলা। একা একা বলে তার শান্তি হয় না, আমাদের প্রশ্ন করেন—নদীর স্রোত দেখেছ তোমরা? আমরা কিছু বলার আগেই আপা আবার বলতে শুরু করেন, নদীর স্রোত কখনো পিছনে চলতে জানে না, সব বাধা ঠেলে সামনে এগিয়ে চলে। এরই নাম স্বাধীনতা, বুঝেছ? আমরা ঘাড় দোলাই আর অপেক্ষায় থাকি দেখি তো এরপর স্বাধীনতা মানে কী হয়! নতুন আপা কেমন অবলীলায় বলে যান—স্বাধীনতা মানে পাখির কাকলি, রাতের জোনাকি, স্বাধীনতা মানে ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু, রাখালের বাঁশি। স্বাধীনতা মানে সাগরের হাতছানি, পাহাড়ের মত উন্নত মম শির।

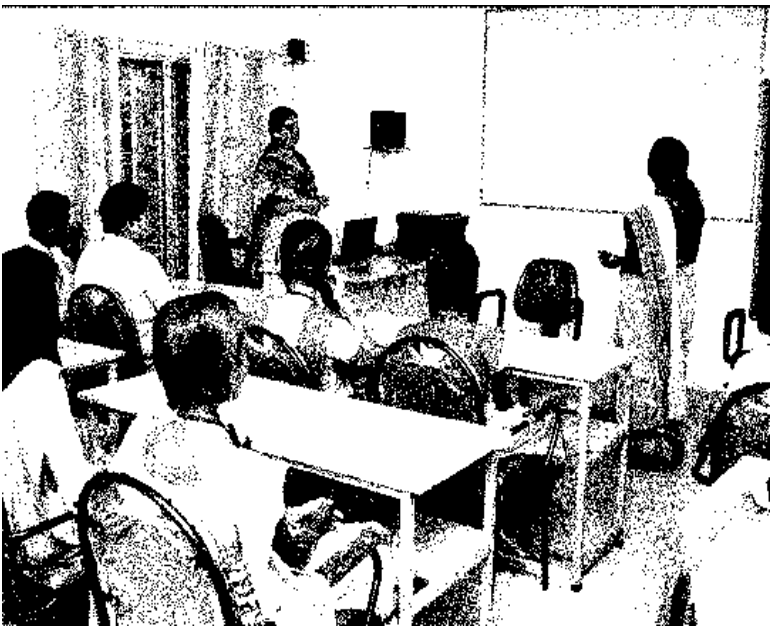

স্বপ্ন বৃত্তান্ত

স্বপ্ন দেখার কোনো নিয়মনীতি থাকে, নাকি আদৌ কোনো ব্যাকরণ থাকে সে কথা আমার ঠিক জানা নেই। আমার বিদ্যের দৌড় এখনো অতদূর পৌঁছেনি। এ বছরই সবেমাত্র স্কুলের সীমানা ডিঙিয়ে আমি কলেজের খোলা আঙিনায় পা রেখেছি। তাই বলে আমি তো আর সবজান্তা হয়ে যাইনি! অথচ তিতলির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আম্মু দিব্যি দেখিয়ে দিয়েছে—যা, তোর ভাইয়ার কাছে শিখে নে স্বপ্ন কেমন করে দেখতে হয়। যা, শাওনের কাছে যা।

কী মুশকিল! নাছোড়া তিতলি। এখন আমি কী করি!

এ ঝামেলার সূচনা ঘটিয়েছে আমাদের আম্মু। সারারাত ভালো ঘুম হয়না তার, নানান রকম স্বপ্ন দেখেই রাতের প্রহর পাড়ি দেয়। কত না রঙবেরঙের স্বপ্ন তার চোখে এসে ধরা দেয়! তারপর দিনের বেলা একটু একটু করে ছাড়বে তার স্বপ্নের সুতো— কোনোদিন দাদুবাড়ির স্বপ্ন, কোনোদিন নানুবাড়ির স্বপ্ন; গত ডিসেম্বরে সবাই মিলে কক্সবাজার থেকে বেড়িয়ে আসার পর মাসখানেক চলল সমুদ্রের স্বপ্ন; হিমছড়ির ঝরণাধারা, ডুলাহাজরার সাফারি পার্ক-সবই নাকি আম্মুর চোখে ঘুরেফিরে আসে, আর সুযোগ পেলেই আমাদের শোনায় সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত। এসব শুনে আব্বু শুধু হা হা করে হাসে। নানারকম ঠাট্টা তামাশাও করে। তার হাসি শুনেই আমি বেশ অনুমান করতে পারি,

এসব স্বপ্ন বিবরণে আব্বুর বিশেষ আস্থা নেই। আম্মুর স্বপ্ন দেখার সঙ্গে নিজের ছোটবেলাকার ঘুড়ি ওড়ানোর গোলমেলে এক তুলনা করে আব্বু বলেন, লাটাই চিনিস খোকা? ঘুড়ির লাটাই?

আমার নাম শাওন। তবু আব্বু যখন খোকা বলে, তখন বেশ মিষ্টি লাগে শুনতে। ঈদের সময় গ্রামের বাড়ি গিয়ে দেখেছি, আমার দাদি এখনো আব্বুকে ডাকে খোকা বলে। ছোট্ট বালকের মত আব্বু বেশ জবাবও দেয় ভারি আদুরে গলায়। আব্বুর মুখে খোকা ডাক শুনে আমারও মনের ভেতরটা কাদামাটির মতো নরম হয়ে যায়, আমি কানখাড়া করে থাকি। আব্বু বলেন, তোর আম্মু রোজ স্বপ্নের লাটাই থেকে সুতো ছাড়ে বুঝেছিস? জাদুর সুতো। সেই সুতো কিছুতেই ফুরোয় না।

আম্মু ক্ষেপে যায়, ক্ষোভ ঝাড়ে,

আমি তাহলে বানিয়ে বানিয়ে রোজ গল্প বলি, কেমন!

আব্বু কুটুশ করে চিমটি কাটে,

আহা! গল্প বানানো কি কম প্রতিভার ব্যাপার নাকি?

আম্মু রেগে যায়,

আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার স্বপ্নের কথা আর তোমাদের কাউকে বলব না।

এক বালকের প্রতিবাদ

উপজেলা শহরে অপুদের স্কুলটাই সবচেয়ে নামকরা। প্রতি বছর এসএসসির রেজাল্ট বেরোলে কিংবা জুনিয়র স্কলারশিপের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা জেলার সব স্কুলের নাম ছাপিয়ে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই স্কুলের নাম। নারায়ান বিএসসি থাকা অবস্থায় এই স্কুল পরপর বেশ ক'বছর জেলা শহরের মডেল স্কুলকেও পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। তখন এলাকার মানুষ বলাবলি করত—নারায়ান বিএসসির ছাত্র ফেল করলেও অংকে লেটার পেয়ে ফেল করে। তার মনে হচ্ছে, ওই স্কুলের সবাই অংক জানে, নারায়ান বাবুর কারণে জানতে হয়। নারায়ান বাবু অংক নাকি গুলে খাওয়াতে জানেন। অপু অবশ্য দেখেনি সেই স্যারকে, শুধু তার গল্প শুনেছে। অপু সিক্সে ভর্তি হবার পরপরই শুনতে পায় হঠাৎ সেই অংকের জাহাজ কোথায় হারিয়ে গেছে নাকি তলিয়ে গেছে কেউ জানে না। অপুর খুব মন খারাপ হয়—নারায়ান স্যারের কাছে অংক শেখাই হবে না? বলতে গেলে মন খারাপ সারা স্কুলেরই। কেউ জানবে না—লোকটা কোথায় গেল! একরাতেই নিরুদ্দেশ! আড়ালে আবডালে দু'একজনকে বলতে শুনেছে, মালাউন আর যাবে কোথায়! বড় জোর ইন্ডিয়ায় পাড়ি দিয়েছে!

চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ, সুখে উল্লাসে কাঁপা...।' আবৃত্তি করবে শামসুর রাহমানের কবিতা। নাম আছে কুইজ প্রতিযোগিতাতেও। সারাদিনের খেলাধুলায় তার অংশগ্রহণ অতি সামান্যই। তবু সে ভীষণ আনন্দিত—এই স্কুলে ভর্তি হবার পর এবারই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে, তার জীবনে এ এক বিরাট ঘটনা।

স্কুলে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান নিয়ে অপুর উত্তেজনা ও ব্যস্ততা দেখে মায়ের চোখে উদ্বেগ ফুটে ওঠে, অপুর বাবাকে খোঁচা দিয়ে বলেন, ছেলের লেখাপড়া যে শিকেয় উঠল সেদিকে খেয়াল আছে?

কোনো জবাব না দিয়ে মিটমিট করে হাসেন অপুর বাবা।

হাসছ যে বড়! ছেলে নেচে বেড়াচ্ছে কিসের এক অনুষ্ঠান নিয়ে, আর তুমি কিনা সব কিছু দেখে শুনেও হাসতে পারছ?

অপুর বাবা এবার হা হা করে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করেন। হাসতে হাসতে এক সময় হাসির লাগাম টেনে সানন্দে ঘোষণা করেন—এর নাম স্বাধীনতা। তুমি থাক ঘরের মধ্যে বন্দি, তুমি এ সবের কী বুঝবে! তাই না অপু, তোর মা স্বাধীনতার কী বুঝবে?